পিকচারেস্ক ইন্ডিয়া অ্যালবাম
৪৮টি অনবদ্য ছবির সংগ্রহ বিনামূল্যে

সাম্পান

সাহিত্য • বিজ্ঞান • সমাজবিজ্ঞান

ভ্রমণসাহিত্য সংখ্যা (ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত)

দ্বাদশ বর্ষ ।। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ।। জানুয়ারি ২০২২ (প্রথম খণ্ড) ISSN: 2395-2342

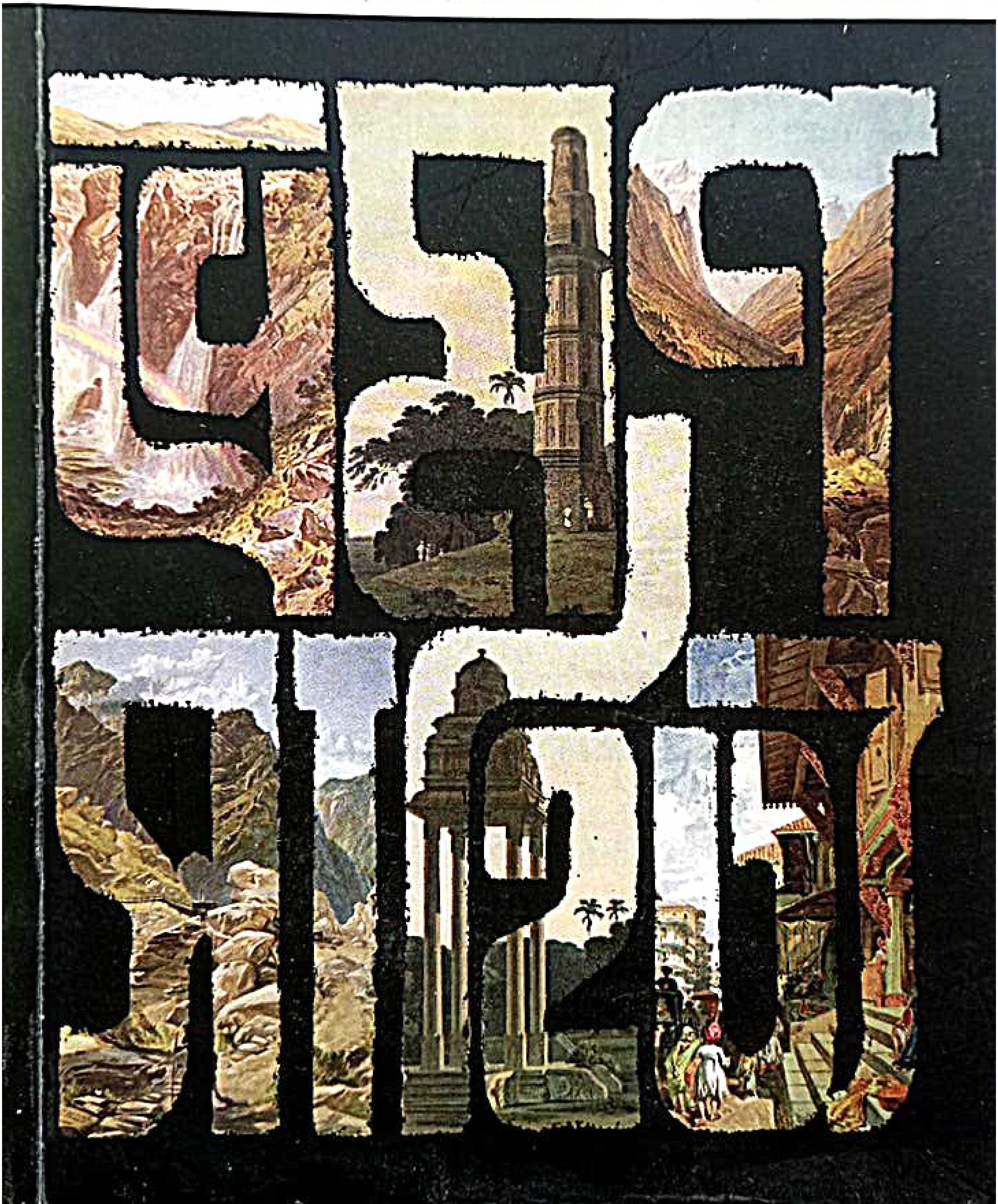

সাম্পান (Sampan)
SAMPAN, Vol. 7 No. 1 & 2, January, 2022 in two parts: Part- I and Part- II
ISSN- 2395-2342

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
প্রয়াত শ্রী শঙ্খ ঘোষ, প্রয়াত শ্রী দীপক কুমার গোস্বামী, শ্রী অশোককুমার রায়, শ্রী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রী সুবিমল মিশ্র, শ্রী অশোক উপাধ্যায় শ্রী সন্দীপ দত্ত, শ্রী তরুণ পাইন, শ্রীমতি হৈমন্তী গাঙ্গুলি, শ্রী অনুরূপ ভৌমিক শ্রী বরেন্দু মন্ডল, শ্রী গৌতম ঘোষ, শ্রী শুভেন্দু শেঠ, শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী শ্রী সৌরভ মাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, দেশ পত্রিকা

সম্পাদক: পল্লব সরকার
সহযোগী সম্পাদক: অতনু মন্ডল
কবিতা সম্পাদক: পার্থজিৎ চন্দ
প্রচ্ছদ: শোভন পাত্র

ওয়েবসাইট: sampanlittlemagazine.business.site
ই-মেইল: sampanlittlemagazine@gmail.com
দূরাভাষ: ৯৮৩৬৩৩১০৫১, ৭৯৮০০৫১৯৩৬
ফেসবুক: https://www.facebook.com/sampan.patrika.5
অথবা লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ 'সাম্পান পত্রিকা'

বর্ণসংস্থাপন: আক্ষরিক, মানকুণ্ডু, হুগলি– ৭১২১৩৯
মুদ্রণ: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা– ৭০০০০৯

বিনিময়: ৫৯৯ টাকা $ 10

মৈমনসিংহ-গীতিকা
কৃষি-সমাজে ভ্রমণের নানা অনুষঙ্গ

অনির্বাণ মান্না

১

পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহের নেত্রকোণার প্রত্যন্ত গ্রাম আইথর-এর এক দরিদ্র পরিবারে চন্দ্রকুমার দে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সে সময় ওই অঞ্চলে গ্রামের ঘরে ঘরে গীত হত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'। ধর্ম নির্বিশেষে কৃষিজীবী মানুষের যাপন থেকে উৎসারিত কাহিনিগুলি লোক-সুরের মায়ায় ভর করে গড়ে তুলেছিল এক সমৃদ্ধ সঙ্গীত-সংস্কৃতি। লোক-গায়কের দল তন্ময় হয়ে গাইতেন। অপার মুগ্ধতায় শুনতেন চন্দ্রকুমার। আর একটু একটু করে সংগ্রহ করে রাখতেন। 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারই প্রথম গীতিকা-সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে-কে আবিষ্কার করেন। সেইসূত্রে দীনেশচন্দ্র সেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে লোকসঙ্গীত-সংগ্রাহক রূপে নিযুক্ত হন চন্দ্রকুমার। তাঁর সংগৃহীত পালাগুলির মধ্যে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় (১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) স্থান পেয়েছে মোট দশটি গীতিকা— 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা', 'দেওয়ান ভাবনা', 'দস্যু কেনারামের পালা', 'রূপবতী', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কাজলরেখা' এবং 'দেওয়ানা মদিনা'। গীতিকবিতাগুলির মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী জনগণের দেশভ্রমণের নানা বৃত্তান্ত। সেগুলিই আমাদের আলোচনার বিষয়।

সমাজের আলোড়িত জনপ্রিয় কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠত গীতিকা-র কাহিনি। লোকনাট্যের আবেশ, নিটোল কাহিনি, চরিত্রের সন্নিবেশ,

---

লেখক বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু বই এবং গবেষণাপত্র। আকর্ষণের বিষয় লোকায়ত সাহিত্য। anirban.manna@gmail.com

ঘটনার বর্ণনা এবং সর্বোপরী গীতিময়তাই পালাগানগুলির শরীর-চিহ্ন। এগুলির নিজস্ব কোনো বিশেষ সুর নেই। যে-অঞ্চলের গীতিকা, সেই অঞ্চলের লোক-সুরেই সাধারণত গাওয়া হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় সাঙ্গীতিক ধারা, ভাটিয়ালির সুরই গৃহীত হয়েছে। ভাটিয়ালি কারুণ্যের সুর। বেশিরভাগ গীতিকাগুলিও বিয়োগান্তক। সুর তাই গীতিকাগুলির ট্রাজিকধর্ম রক্ষার অনুকূল হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাটিয়ালি গান মাঝিমাল্লার গান। স্রোতের অনুকূলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে মনের বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের গান। নদীর স্রোত থেমে থাকে না। বয়ে চলে নিরবধি। ভ্রাম্যমান গায়কের সুরারোপিত গীতিকা-র চরিত্রগুলিও সুরের ডিঙায় ভর করে বয়ে চলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কাহিনি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাই শ্রোতা কিংবা পাঠকও ভেসে পড়েন চলমান জীবনের স্রোতে। গীতিকার সম্ভাব্য জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে বলা যায়—

> "লোকের মুখে-মুখে কাহিনীর রেণুগুলো সমাবৃত হতো, আর একদিকে লোককথা হিসেবে এক একটি ঘটনাগুচ্ছ উঠত গড়ে; অন্যদিকে, ভ্রাম্যমাণ গায়ক-তথা-ভাটের দল সেই সব কাহিনীকে গানের সুরে বেঁধে যে শিল্পরূপে পরিণতি দিতেন, সেগুলিই হয়ে দাঁড়াত ঐ বীরকথা: গাথা নারাশংসী। মধ্যযুগের গীতিকার প্রাক রূপ।"[১]

মানুষ প্রেমের টানে, জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে, ব্যবসা-বাণিজ্য, তীর্থভ্রমণ কিংবা শুধুমাত্র অভিমানে বেরিয়ে পড়েছে অজানার উদ্দেশ্যে। মানুষের সুখদুঃখের পাশাপাশি পথঘাটের দুর্গমতা, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, বর্ষায় বিস্ফারিত নদী, ডাকাত কিংবা সাপের ভয়ও গীতিকাগুলির উপজীব্য। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভ্রমণসাহিত্যের তত্ত্ব মিলিয়ে আলোচনায় সবকিছু মিলে যাবে তা নয়। কিন্তু এটুকু সহজেই জানা যাবে যে সে যুগে লোকজীবন ভ্রমণ নামক কর্মটির গুরুত্ব বা স্থান কী ছিল; ভ্রমণ থেকে মানুষ কী আশা করত। আর জানা যাবে ভ্রমণে ব্যবহৃত স্থলযান, জলযান, ভ্রমণসঙ্গী পশুদের কথা; বাড়ি থেকে বিদায়কালের শুভক্ষণের মুহূর্তকথা; যাত্রাকালে সুলক্ষণ, কুলক্ষণ প্রসঙ্গ; অজানা পথে অভিযানের বিপদ-আপদ-আশঙ্কা; ঘরছাড়া মানুষের নিকটাত্মীয়ের বিরহবেদনা; অতিথিসেবা; পথে প্রান্তরে প্রাকৃতির অনাবিল রূপের কথা।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন যে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোন না

কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বনে রচিত। কাহিনিগুলির পটভূমি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—

"উত্তরে গারো পাহাড়, জয়ন্তী ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী,— তাহাদের পাদলেহন করিয়া এক দিকে সোমেশ্বরী ও অপর দিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্বে নানা ধারায় ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র কচিৎ ভৈরব রবে, কচিৎ বীণার ন্যায় মধুর নিক্কণে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদনদীর অন্তর্বর্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও জলাশয়কীর্ণ। বিলগুলিকে তদঞ্চলে 'হাওর' বলে। 'তলার হাওর', 'জেলের হাওর', 'বাবারার হাওর', প্রভৃতি বহু বিল এই ছড়াগুলিতে উল্লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, 'হাওর', 'সায়র' প্রভৃতি শব্দ 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশ।

উত্তরে সুষঙ্গ-দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকণা ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্বর্তী পল্লীসমূহ বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয়ক্ষেত্র।"[২]

মোটামুটিভাবে এই ভৌগোলিক পটভূমিকায় গীতিকায় বর্ণিত চরিত্রগুলির পথ-পরিক্রমা। শহরে থাকলে গ্রামের বাড়িটি আমাদের কাছে যেমন 'দেশের বাড়ি' হয়ে যায় তেমনই গীতিকায় বর্ণিত 'দেশ' আসলে চরিত্রগুলির বসবাসস্থল আর বিদেশ কোনও নতুন দেশ নয়, অপরিচিত কিংবা পরিচিত দূরবর্তী কোনও অঞ্চল। এই সূত্র ধরেই 'বিদেশ', 'বৈদেশী', 'ভিনদেশী' শব্দগুলি রচেছেন কবিরা।

গীতিকার পালাকারদের কল্পনায় পৃথিবীর আকার গোলা নয়, চার কোণা। 'মহুয়া' পালার স্রষ্টা দ্বিজকানাইয়ের বন্দনাগীতি— "চাইরকুনা পিরথিমি গো বইন্ধ্যা মন করলাম স্থির।" 'মলুয়া' গীতিকার পালাকারও (চন্দ্রাবতী?) 'চারকুনা পৃথিবী' বলেছেন। 'মলুয়া'-র গীতিকায় আরও বলছেন—

"বৃক্ষের মধ্যে বন্দিয়া গাই আদ্যের তুলসী
তীর্থের মধ্যে বন্দিয়া গাই গয়া আর কাশী।।"

গয়া ও কাশীর গুরুত্ব সুদূর পূর্ববঙ্গেও কিছু কম ছিল না। পথের দুর্গমতাকে উপেক্ষা করে দেবতার দুয়ারে পৌঁছতে সে অঞ্চলের লোকও পাড়ি জমাত।

প্রথাগত বন্দনাগীতি বাদ দিলে 'মহুয়া' পালা শুরু হয়েছে ভয়ংকরতম চরিত্র ডাকাত হুমরা বেদের প্রসঙ্গ দিয়ে। সরাসরি হুমরা বেদের কথা না বলে তার

আবাসস্থল যে কত দুর্গম এবং ভয়ংকর সেই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন দ্বিজকানাই—

উত্তর্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্‌বত।।
হিমানী পর্‌বত পারে তাহারই উত্তরে।
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর।।
চান্দ সুরুয নাই আন্দারিতে ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে মাইন্‌সের নাই লরাচরা।।
বনেতে করিত বাস হুমরা বাইদ্যা নাম।
তাহার কথা শুন কইরে ইন্দু মুসলমান।।
ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দ্দার।
মাইন্‌কা নামে ছুডু ভাই আছিল তার।।
ঘুরিয়া ফিরিয়া তারা ভ্রমে নানা দেশ।
অচরিত কাইনী কথা কইবাম সবিশেষ।।

একদিকে দীর্ঘ দূরত্ব বোঝাতে অন্যদিকে অবশ্যই পায়ে হেঁটে সেই পথ অতিক্রম করার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। হুমরা বেদের দল নানান দেশ ঘুরে ঘুরে ধনু নদীর পারে অবস্থিত কাঞ্চনপুর গ্রামে এল। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি করল ছ'মাসের এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে। করে দেশে ফিরে গেল তারা। হুমরা বেদের চুরি করা কন্যাই হল মহুয়া। তার বয়স এখন ষোল। এখন হুমরা আর ডাকাতি করে না। রাস্তাঘাটে তামাসা দেখিয়ে বেড়ায়। দলের অন্যতম বাজিকর মহুয়া। হুমরার ভাইয়ের নাম মানিক। হুমরা ডাকে— মাইন্‌কিয়া। হুমরা ভাইকে বিদেশে খেলা দেখাতে যাবার কথা বললে মানিক রাজি হয়ে যায় এবং শুক্রবারে বাড়ি থেকে রওনা হবার কথা বলে। শুক্রবার জুম্মাবার। তাদের কাছে শুভদিন। হিন্দুদের কাছে যেমন— 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা'।

গারো পাহাড়ের বনপ্রদেশ থেকে যাযাবর বেদেদের বিদেশযাত্রার দৃশ্যের বর্ণনাটিকে বাংলা সাহিত্যে এক্সক্লুসিভ তকমা দেওয়া যায়—

হুমড়া [য] বাইদ্যা ডাক দিয়া কয় মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
খেলা দেখাইবারে চল বৈদেশেতে যাই।।
মাইন্‌কিয়া বইদ্যা কয় ভাই শুন দিয়া মন।
বৈদেশেতে যাব আমরা শুক্কর বাইর‍্যা দিন।।
শুক্কুর বাইর‍্যা দিন আইল সকালে উঠিয়া।

দলের লোক চলে যত গাট্টীবুচ্‌কা লইয়া।।
আগে চলে হুমরা বাইদ্যা পাছে মাইন্‌কিয়া ভাই।
তার পাছে চলে লোক লেখা জুখা নাই।।
বাঁশ তাম্বু লইল সবে দড়ি আর কাছি।
* * * *
তোতা লইল ময়না লইল আরো লইল টিয়া।
সোণামুখী দইয়ল লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া।।
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত লইব আর।
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়।।
শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা ধরে।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে।।
তারও সঙ্গেতে চলে মহুয়া সুন্দরী।
তার সঙ্গে পালঙ্ক সই গলা ধরাধরি।।
এক দুই তিন করি মাস গুয়াইল।
বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল।।"

লটবহর সমেত আস্ত একটা বেদেদের দল চলেছে। পুরোভাগে হুমরা, তারপরে আছে ভাই মানিক। সঙ্গে নিয়েছে খেলা দেখানোর সরঞ্জাম— তোতা, ময়না, দোয়েল, টিয়া ইত্যাদি পাখি এবং ঘোড়া, গাধা। আর নিয়েছে রাও চণ্ডালের হাড়। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এটা সম্ভবত রাজ-চণ্ডালের অপভ্রংশ। রাজ-চণ্ডাল অর্থাৎ চণ্ডালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বেদেরা খেলা দেখাবার সময় এই হাড় নানা জিনিসে ঠেকিয়ে ভেল্কি দেখায়। তাদের বিশ্বাস এই হাড় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। বেদেদের সঙ্গে চলেছে তাদের পোষা শিকারী কুকুর। প্রয়োজনে তারা শিয়াল, সজারু শিকার করে বেদেদের মাংস যোগান দিতে পারে। আর আছে মহুয়ার ছেলেবেলাকার সই পালঙ্ক। একদিন, দুদিন, তিনদিন করে যেতে যেতে তাদের সময় লাগল একমাস।

হুমরা বেদের দলের তামাসা দেখতে নদ্যার চান (চাঁদ) ঠাকুর তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়-বাড়িতে বেদেরা খেলা দেখায়। মহুয়াকে দেখে নদ্যার চান প্রেমে বিভোর। খেলা দেখে খুশি হয়ে নদ্যার ঠাকুর বেদেদের বসবাসের জন্য জমি, প্রচুর টাকাকড়ি, শাল, রন্ধনের উপকরণ দেয়। তবে মহুয়ার প্রতি পূর্বরাগটাই মূল কারণ বটে। জলের ঘাটে নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার আলাপের চিত্র—

তাম্‌সা কইরিয়া বাঁদ্যার ছেড়ী (মেয়ে) ফিরে নিজের বাড়ি।
নদ্যার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তাড়াতাড়ি।।
শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক।।
সন্ধ্যা বেলায় চান্নি (চাঁদনী) উঠে সুরুয বইসে পাটে।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে।।...

"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।।"
"শুন শুন ভিন দেশী কুমার বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছলা কথা আমার মনে নাই।।"
"নবীন যইবন কইন্যা ভুলা তোমার মন।
এক রাতিরে এই কথাটা হইল বিস্মরণ।।"
"তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্‌জায় মরি।।...

"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা (স্রোতের শ্যাওলা) অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।"...

মহুয়া তার অতীত-বৃত্তান্ত জানে। বেদেদের সঙ্গে তার স্রোতের শ্যাওলার মত জীবন। যাযাবরের জীবন ছেড়ে তার হৃদয়ও আকুল হয়ে ওঠে একটুকরো গৃহকোণের জন্য। কিন্তু সে জানে তা সম্ভব না। তাই নদ্যার ঠাকুর তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে বুকে পাথর রেখে সে বলে—

"লজ্‌জা নাই নির্লজ্জ্র ঠাকুর লজ্‌জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।"

জবাবে নদ্যার ঠাকুর বলেন—

"কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।।"

হুমরা বেদের বুঝতে বাঁকি থাকে না মহুয়া নদ্যার ঠাকুরের জন্য পাগল হয়ে গেছে। তাই সে সেই দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রাত্রিবেলায় দেশ ছেড়ে চলে

যাবে বেদের দল। মহুয়া ভগ্নহৃদয়ে শেষবিদায় জানিয়েছে নদ্যার চাঁদকে। বন্ধুকে নিয়ে দেশান্তরী হবার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হল না। কিন্তু যাবার আগে উত্তর দেশে অর্থাৎ গারো পাহাড়ের দেশে নদ্যার ঠাকুরকে যাবার নিমন্ত্রণ করে গেল মহুয়া—

যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমারে।
উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে।।
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু অমনি বরাবর।
নল খাগড়ের বেড়া আছে দক্ষিণ দেয়ারিয়া ঘর।।
সেই খানেতে আমরা সবে বাস্যা কয় মাস থাকি।
সেইখানে যাইও বন্ধু অতিথ হইয়া তুমি।।
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।
জল পান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিরা।।
সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা।
ঘরে আছে মইযের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা।।
আইজের দেখা শেষ দেখা রে বন্ধু আর না হবে দেখা।।

প্রেমিক যখন অতিথিরূপে তার দেশে যাবে তখন বাড়ি চিনতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে কারণেই এমন বিস্তৃত বিবরণ দেয় মহুয়া। তাছাড়া অতিথি আপ্যায়ন কীভাবে হবে তারও একটি আন্তরিক বর্ণনা দেয়। এর কতটা সত্যি কতটা তার কল্পনা বোঝা দায়। প্রকৃতি ও ঘরগেরস্থালির মায়াবী রূপকথার মত যে ছবি সে আঁকে তা আসলে হয়তো তার মনের কোণে ইচ্ছে হয়ে লুকিয়ে ছিল। চলাচল এবং স্থিতির এই দ্বন্দ্ব মানবজীবনে অলঙ্কারের মত।

ওদিকে বেদের দলের চলে যাবার খবরে নদ্যার ঠাকুর খাবারের গ্রাস ফেলে দিল মুখ থেকে। অবস্থা পাগলপ্রায়। সে আর দেশে থাকতে চায় না। দেশান্তরী হতে চায়। ব্যর্থ প্রেমের বেদনাকে লুকাতে নদ্যার ঠাকুর বলে—

"বিদায় দে মা জননী বিদায় দেও আমারে।
তীর্থ করিতে আমি যাইবাম দেশান্তরে।।
ভাত রাইন্দো মা জননী না ফালাইও ফেনা।
আমি পুত্র বৈদেশে যাইতে না করিও মানা।।"

তীর্থযাত্রায় মা তাকে যেন বাধা না দেয় তার অনুরোধ করছে নদ্যার ঠাকুর। পাশাপাশি ফ্যানভাত খেয়ে তীর্থযাত্রার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে। ফ্যানভাত খেলে

অনেকক্ষণ ভরাপেট থাকে— একথা যেমন সত্য তেমনই দীর্ঘদিন মায়ের হাতের রান্না ছাড়া থাকতে হবে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে খাবারের অনিশ্চয়তার মুহূর্তটি নিমেষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে মায়ের কাছে তো সন্তান চোখের মণির মতো। তাই মা ছেলেকে বিদেশে যেতে দিতে মোটেই রাজি নয়—

“বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায়।
দেশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায়।।”

সন্তানের সঙ্গে মায়ের নাড়ীর যোগ। বিদেশবিভুঁইয়ে সন্তানের মৃত্যু হলে সে খবর আসার আগেই মা ঠিক জেনে যায়। এত কথা বলা সত্ত্বেও নদ্যার চাঁদকে বাড়িতে আটকে রাখতে পারে না মা। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয় সে। তারপর পথে পথে খুঁজে বেড়ায় মহুয়ার চিহ্ন। কোন পথে গেছে বেদের দল?

প্রেমধর্মে গীতিকাগুলি সমুজ্জ্বল। প্রেমই এখানে ধর্ম। প্রেমই এখানে দেবতা এবং তীর্থক্ষেত্র। মাসের পর মাস মহুয়াকে খুঁজে বেড়ায় নদ্যার চাঁদ—

“কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন।
বাদ্যার কন্যা খুঁজতে ঠাকুর ভর্‌মে তিরভুবন।।”

একটি প্রচলিত ছড়া—

‘কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন’।

এই ছড়াটির আদলে গীতিকায় গয়া এবং কাশীর মহিমাকে তুচ্ছ করে নদ্যার ঠাকুরের কাছে মহুয়ার অন্বেষণ বড় হয়ে উঠেছে। প্রেমিকার জন্য অন্বেষণ, এও এক অনন্য ভ্রমণ।

অবশেষে দেখা হয় দুজনের। তারা ঠিক করে দুজনেই দেশান্তরী হবে। যেদিকে দুচোখ যায়। আশ্রয় নেবে কোনো গহীন বনে। নদীর পারে রাখা ছিল হুমরার তেজী ঘোড়া। তাতে চড়ে বসল তারা—

“চান্দ-সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শণেতে (শূন্যেতে) উড়িল।।”

স্থলপথ শেষ হয়ে জলপথ শুরু। ঘোড়া ছেড়ে দিল তারা। সামনে পাহাড়িয়া নদী। এক বণিকের নৌকায় উঠল দুজনে। মহুয়ার রূপে পাগল বণিক কৌশলে নদ্যার ঠাকুরকে নদীতে ফেলে দিল। অসহায় মহুয়া বুদ্ধি করে পাহাড়ী তক্ষকের

বিষ মিশ্রিত পান খাইয়ে বণিক ও তার সঙ্গীদের হত্যা করল। এদিকে এক সন্ন্যাসী প্রাণ বাঁচাল নদ্যার ঠাকুরের। সেখানে মহুয়া উপস্থিত হলে সন্ন্যাসীও মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়। কিন্তু সেখানেও জয়ী হয় নারীর প্রেমের একনিষ্ঠা। রাত্রিবেলায় দুর্বল স্বামীকে কাঁধে তুলে নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে চলে আসে মহুয়া। শেষরক্ষা কিন্তু হয় না। শিকারী কুকুর নিয়ে হাজির হয় হুমরা বেদে। নদ্যার চাঁদকে হত্যার জন্য হুমরা মহুয়ার হাতে বিষছুরি তুলে দেয়। নিরুপায়, অসহায় মহুয়া আত্মঘাতিনী হয়। অন্যদিকে হুমরার নির্দেশে বেদের দল হত্যা করে নদ্যার চাঁদকে।

নায়ক নায়িকার অবিরাম যাত্রা কাহিনিকে গতিশীল এবং নাটকীয় করে তোলে। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও বা নৌকায় কিংবা স্বামীকে কাঁধে নিয়ে মহুয়ার যে পরিক্রমা, দেশ থেকে দেশান্তরে— তার চালিকা শক্তি অবশ্যই প্রেম। কিন্তু তাদের অন্তিম ভ্রমণ যে না ফেরার দেশের উদ্দেশ্যে তার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল মহুয়া—

"বনের খেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ।
এই কথা কহি আমি শুনহ বিশেষ।।"

৩

'মলুয়া' পালার নায়ক চান্দ বিনোদ। জলপ্লাবন এবং দুর্ভিক্ষে আর্থিক বিপর্যয় চান্দ বিনোদকে জীবিকার জন্য বাইরে বেরোতে বাধ্য করেছিল। কুড়া শিকার তার পেশা। পাখি দিয়ে পাখি শিকার করে অর্থোপার্জনের জন্য সে বাইরে যেতে চায়। মায়ের কাছে বিদায়-অনুমতি নিল। 'মহুয়া' পালায় নদ্যার ঠাকুর ফ্যানভাত খেয়ে বিদেশ যাত্রা করেছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চান্দ বিনোদ শূন্য জঠরেই রওনা হয়—

"মায়ের আক্ষির জলে বুক যাইরে ভাসি।
ঘরতনে বাইর অইল বিনোদ বিলাতের (বিদেশ-গমনোদ্যত) উপাসী।।"

যাবার পথে বোনের বাড়িতে যায় চান্দ বিনোদ। বোন তাকে চুন, খয়ের দিয়ে সাচি পান সেজে দেয়। শালিধানের চিড়ে কাপড়ে গিঁট দিয়ে বাঁধে চান্দ বিনোদ। সঙ্গে নেয় শবরী কলা। আর নেয় তামুক, টিক্কা। যতদূর দেখা যায় বোন তাকিয়ে থাকে ভাইয়ের দিকে।

প্রিয়জন বিদেশে গেলে ঘরে থাকা মানুষগুলির উদ্বেগের অন্ত থাকে না। চান্দ বিনোদ চলে যাবার পর তার মা ও বোনের অবস্থাও ঠিক তেমনই—

"মায়ে বইনে না দেখিল বুকে রইল শেল।
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ কোন বা দেশে গেল।।"

চান্দ বিনোদ আড়ালিয়া গ্রামে উপস্থিত হল। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। গুল্মলতা আবৃত পুকুর। চারদিকে কলাগাছ, মান্দার গাছের বেড়া। কদমগাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে। পুকুর ঘাটে গিয়ে মলুয়া ভিনদেশী পুরুষকে দেখে চমৎকৃত হয় এবং অতিথি হয়ে তার বাপের বাড়িতে আসার কথা বলে। বাইরে বের হলে কত রকমের বিপদ থাকে চান্দ বিনোদকে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মলুয়া। কোনপথে গেলে বিপদ নেই তাও জানায়। চান্দ বিনোদ কীভাবে মলুয়াদের বাড়ি আসবে তার পথনির্দেশ দিয়ে দেয় মলুয়া। নতুন জায়গায় যে-কোনো মানুষের কাছে এমন আতিথেয়তা পাওয়া তো স্বর্গ লাভের সমতুল—

'সন্ধ্যাকালে অতিথ আইল ভিন দেশে ঘর।
পাঁচ পুত্রে ডাক্যা কয় সাধু হীরাধর।।
লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি।
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রান্ধে পরম রান্ধুনি।।
মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
মাছের সরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার।।
কাইট্টা লইছে কই মাছ চরচরি খারা।
ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয়া কাল্যাজিরা।।
একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি।
শুকনা মাছ পুইড়া রান্ধে আগল বেসাতি।।'

ভোজনের পরে লং-এলাচি দিয়ে সাচি পান খেয়ে শীতলপাটি বিছানো উত্তম বিছানায় শুয়ে সুখে নিদ্রা গেল বিদেশী চান্দ বিনোদ। কিন্তু এরপর ঘটক বিনোদের সম্বন্ধ নিয়ে মলুয়াদের বাড়ি গেলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। বিনোদের দারিদ্র্যই এর অন্যতম কারণ। চান্দ বিনোদের অন্তরাত্মা জাগ্রত হয়। অর্থ উপার্জনের জন্য তাকে বিদেশে যেতেই হবে। আগের বার খালি পেটে বেরিয়েছিল। এবার কাঁচালঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে মায়ের কাছে বিদায় নেয়। মা ও সন্তানের বিচ্ছেদের দৃশ্যটি বড় মর্মস্পর্শী—

'বৈদেশেতে যায় যাদু যদ্দুর দেখা যায়।
পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায়।।
বাঁশের ঝাড় বনজঙ্গলে পুতের পিষ্ঠে পড়ে।

আখির পানি মুছ্যো মায় ফির্যা আইল ঘরে।।
এক মাস দুই মাস তিন মাস যায়।
ছয় সাত আট করি বচ্ছর গোয়ায়।।"

তারপর একদিন প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিনোদ ফিরে আসে। বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার বিবাহ হল। কিন্তু সুখ স্থায়ী হল না বেশিদিন। কাজীর নজর মলুয়ার উপর পড়ল। কিন্তু কাজীর সব প্রয়াস ব্যর্থ হল সতী-সাধ্বী মলুয়ার দৃঢ়তার কাছে। ব্যর্থ হয় দেওয়ানের অভিসন্ধিও। কিন্তু আত্মীয়পরিজন মলুয়ার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিনোদ পুনর্বার বিবাহ করে। এরপরেও কোড়া শিকারে যাওয়া বিনোদকে সাপে কামড়ালে মলুয়া স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে বেহুলার মতো।

'মলুয়া' গীতিকায় ভ্রমণের অন্যতম উপায় 'মন পবনের নাও'। সে যান কবির কল্পনা হয়তো। কিন্তু বাস্তবে যে নাও মৃত্যুপথযাত্রী বিনোদকে দ্রুত ওঝার কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সেই নাওই ভাঙা অবস্থায় মলুয়ার অন্তিমযাত্রার বাহন হয়েছে। মলুয়ার যে সতীত্ব-শক্তি স্বামী বিনোদের প্রাণ রক্ষার হাতিয়ার হল, সেই সতীত্বের প্রতি প্রশ্নচিহ্ন মলুয়ার বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে নির্বাপিত করে। তাই মন পবনের নাও যেন নারীর দুঃখমোচনের সহকারী হয়ে উঠেছে—

"ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর।।"

৪

'রূপবতী' গীতিকায় রামপুর শহরের রাজা রাজচন্দ্র, নবাবের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎলাভের জন্য, খাজনাপ্রদান এবং নিছক ভ্রমণের জন্য মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথমত, যাত্রার শুভদিনক্ষণ বলে দেন গণকঠাকুর। পানসি সাজানোর দায়িত্ব পেল কানা চইতা এবং উভুতিয়া নামের দুই ভাই। ষোল দাঁড়ের পালতোলা নৌকা সজ্জিত হল। নবাবকে ভেট দেবার জন্য নেওয়া হল অভ্রের চিরুণী, রঙিন ডালা ও পাখা, হাতির দাঁতের পাটী, গজমতির মালা। বেশ কয়েকজন গায়ক ও বাদককে সঙ্গে নেওয়া হল। আর নেওয়া হল দশ হাজার টাকা খাজনা। রাজা ভ্রমণে গেলে নগরবাসী বিদায় জানাতে আসে। বিনিময়ে তারা দানদক্ষিণা পায়। এতে রাজার পুণ্য হয়—

"উজান পানি বাইয়া রাজা পান্সী বাইয়া যায়।
নাগরীয়া যত লোক করিল বিদায়।।

দানদক্ষিণা আদি পুণ্যকার্য্য করি।
রাণীর কাছে সঁপিয়া গেল কুলের কুমারী।।"

নবাবের কাছে পৌঁছতে রাজার চারমাস লাগল। পূর্বদেশীয় চিরুণীর কথা নবাব শুধু লোকমুখেই শুনেছেন। রাজার কাছ থেকে চিরুণী, শীতলপাটি, দশহাজার টাকা ইত্যাদি উপহার পেয়ে নবাব যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু তারপর তিন বছর কেটে গেল অথচ রাজা দেশে ফিরে এলেন না। এদিকে তাঁর কুমারী কন্যা এতদিনে বিবাহযোগ্যা। রাণী কন্যার প্রসঙ্গ জানিয়ে রাজাকে পত্র দিলেন। এই পত্রই কাল হয়ে উঠল। নবাব বিয়ে করতে চায় রাজার কন্যা রূপবতীকে। তাই সম্মান রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি রূপবতীকে বাড়ির চাকর মদনের হাতে সমর্পণ করে বরকনেকে নৌকায় চাপিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে গভীর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হল—

"নিশিরাইতে বাইয়া তারা যায় তরীখানি।
পাল টাঙ্গইয়া চলে তের বাঁক পানি।।
চৌদ্দ বাঁকের মাথায় গিয়া রাত্রি ভোর হইল।
সেই খানে গিয়া কানা তরী লাগাইল।।"

ভাটির দেশে নদী কিছুদূর অন্তর পথ বদলায়। সেই রকম মোট চৌদ্দটি বাঁক অতিক্রম করে মদন এবং রূপবতীকে গভীর জঙ্গলে রেখে আসা হল। এরপর কাহিনিতে নানান ঘাতপ্রতিঘাত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য 'রূপবতী' একটি মিলনাত্মক গীতিকা হয়ে উঠেছে।

৫

শুভক্ষণ দেখে মানুষ দূরদেশে যাত্রা করে। 'মহুয়া' পালায় হুমরা বেদে তার দলবল নিয়ে শুক্রবার যাত্রা করেছিল। 'রূপবতী' পালায় রাজা রাজচন্দ্র গণকঠাকুরকে দিয়ে হিসেব কষে শুভক্ষণ নির্বাচন করে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেছিলেন। বিপরীতভাবে ভ্রমণকালে অমঙ্গলসূচক কিছু দেখলে সেটাকে বিপদের পূর্বাভাস বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, 'দেওয়ানা মদিনা' পালায় কেন্দ্রীয় চরিত্র দুলাল তার ভাই আলালের কথায় নিজের স্ত্রী মদিনাকে তালাক দিয়ে দেওয়ান হওয়ার লোভে অন্যত্র বিবাহ করেছে। তালাকনামা পেয়ে শোকে মৃত্যু হয় মদিনার। অবশ্য মদিনাকে তালাক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দুলাল। ভাইকে, নতুন স্ত্রীকে না জানিয়ে সে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পথে কতকগুলো অমঙ্গলসূচক ঘটনা দুলালের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

মদিনার মৃত্যু সংবাদ পাঠক-শ্রোতা আগে থেকেই জানে। দুলালও বুঝতে পারে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে—

"ঘরতনে বাহির অইয়া পন্থে দিল মেলা।
লোক লস্কর নাই যে চলিল একেলা।।
যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বার যে চাহিল।।
তার পরে দিয়া সামনে দেখে তেলী।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী।।
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া।।
"না জানি আল্লাজী আমার কি লেখছুইন কপালে।
কুলক্ষণ দেখ্‌লাম কত পন্থে মেলা দিয়া।।"

যাত্রাপথে কোনো কিছুর কারণে বাধার সৃষ্টি হলে তা যে অমঙ্গলজনক 'কমলা' পালাতেও সেই ইঙ্গিত মেলে—

"চরণে ঠেকিল মাটি বাধা পড়ে পথে।
আজি কেন হিয়া মোর কাপিল চলিতে।।"

৬

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ায় এবং স্থলপথ জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম বলে স্থলপথের চেয়ে জলপথেই ভ্রমণকার্য বেশি সংঘটিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে স্থলযানের চেয়ে জলযানের প্রসঙ্গ এসেছে বেশি। জলযান বলতে অবশ্যই নৌকা। কত নামে তার পরিচয়। ডিঙা, নৌকা, নাও, পানসী, মন পবনের নাও, তরী, তরণী, ময়ূরপঙ্খী নাও ইত্যাদি। আর আছে ভাওল্যা—

"এই কথা শুনিয়া মাধব কোন কাম করে।
ভাওল্যা সাজাইয়া গেল দেওয়ান ভাবনার ঘরে।"

('দেওয়ান ভাবনা')

ভাওল্যা মানে ভাওয়ালিয়া। পূর্ববঙ্গের বড়লোকদের ব্যবহৃত এক ধরনের বড় আকারের সখের নৌকো।

ডাঙায় যাতায়াতের প্রসঙ্গে 'মহুয়া' এবং 'মলুয়া' পালায় ঘোড়ার কথা এসেছে। 'কমলা' পালায় মানিক চাকলাদারের দশটি হাতি এবং তিরিশটি ঘোড়ার অস্তিত্ব

প্রকৃতপক্ষে বৈভবের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই পালাতেই কমলা তার মা-কে নিয়ে পাল্কীতে করে মামাবাড়ি গেছে—

"পাল্কী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী।"

৭

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রতিভাবান কবিরা ঘটনাক্রমের ছবি এঁকে গেছেন। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। দেশ থেকে দেশান্তরে। স্রোতের মতো গতিশীল। চিত্রকল্প রচনার দক্ষতায় কবিরা পাঠক কিংবা দর্শক-শ্রোতার সামনে হাজির করেছেন চরিত্র সমেত ঘটনাপ্রবাহকে। যাতায়াতের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও চরিত্রগুলি কোনও একটি স্থানে আবদ্ধ থাকে না। নিরন্তর তাদের পথ চলা। চলার পথে প্রকৃতিও তার সৌন্দর্য মেলে ধরেছে পাঠকের সামনে। তাই একটি ভ্রামণিক-সত্তা গীতিকাগুলির চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন অবস্থান করে তেমনই পাঠকও গীতিকা-পাঠে মানস-ভ্রমণের আনন্দলাভ করে— "সুতরাং পূর্ব-মৈমনসিংহের ঝিল ও তড়াগ, সর্পব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যভূমি, কুড়াপাখীর গুরুগম্ভীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, 'বারদুয়ারী ঘর' ও সানবাঁধা পুকুরঘাট, স্বর্ণপ্রসূ শালী-ধান্যক্ষেত্র ও সুরভিপূর্ণ কেয়াবন এই গাথাগুলির কল্যাণে আমাদের একান্ত পরিচিত ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। টেমস নদীর সুড়ঙ্গ, নটারডেম, রোমের ভাটিকান প্রভৃতি দেখিতে আমাদের আর ততটা আগ্রহ নাই, মলুয়ার পদাঙ্কলাঞ্ছিত আরালিয়া গ্রাম ও বংশদণ্ডের উর্দ্ধে রজ্জুর উপর নর্তনশীলা মহুয়া নর্তকীর অপূর্ব নর্তনের স্মৃতিবাহী বামুনকান্দা পল্লী দেখিতে যতটা ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।"[৩]

সূত্রনির্দেশ

১. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ: ৯১

২. সেন, দীনেশচন্দ্র, 'ভূমিকা', 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ: ৫

৩. ওই, পৃ: ২১

সহায়ক গ্রন্থ

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, 'গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুন, ২০১৫

২. মান্না, অনির্বাণ, 'নান্দনিকতার আলোকে লোকসংস্কৃতি', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০০৭